বাঙালি-সত্তার বিকাশ ও মন্দিরস্থাপত্যের অ াঞ্চলিক রীতি

প্রনব রায়

বালার ধর্মীয় স্থাপত্য নিয়ে আলোচনার আগে অখণ্ড বাংলা দেশ ও বাঙালিসত্তার উদ্ভব প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে । একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে যে বাঙালিচরিত্র গড়ে ওঠে, তার ফলে সে সৃষ্টি করে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। তার জীবনচর্যা, ধ্যানধারণা থেকে জন্ম নেয় সাহিত্য, শিল্প, দর্শন। এক স্বতন্ত্র সত্তায় সে আত্মপ্রকাশ করে। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পারিপার্শ্ব এসবের উৎসমূলে থাকলেও রাজনৈতিক প্রভাবও তার সৃষ্টিকর্মে বহুলাংশে ইন্ধন জুগিয়েছে।

সমগ্র ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে এই দেশ একসময় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল। এখনও ত ার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি এবং তা সম্ভবও নয়। কিন্তু এক বিশেষ পরিবেশ - পরিমণ্ডল, জলবায়ু, মাটি, নদনদী এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল স্বতন্ত্র সত্তার। সেই সত্তাকে বিকশিত করে তুলতে তার নিজস্ব ভাষার জন্ম হয়েছে। অবিরত মননের মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টি করেছে তার সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন। এই স্বতন্ত্র সত্তার বিকাশ ঘটেছে ভ ারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের মধ্যেই।

ভারতের পূর্বভাগে অবস্থিত বর্তমান বাংলা বা বাংলাদেশ প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল । গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, সুহ্ম, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত — এইসব প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজ্য বা জনপদগুলিই পরবর্তী কালে এক অখণ্ড বাংলা বা বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন যুগে ঐ সব জনপদের সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে বহুবার । প্রাচীন বঙ্গ জনপদের ভূভাগ মোটামুটিভাবে গঠিত ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুব, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে, যদিও নানা সময়ে এর পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক বাংলা বা বাংলাদেশ প্রাচীনকালে চারটি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল — বরেন্দ্রী, সুহ্ম (বা রাঢ়া), বঙ্গ ও কামরূপ । 'গৌড় বলতে সাধারণত রাঢ় - বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম বাংলা আর বঙ্গ শব্দে বঙ্গ-কামরূপ অর্থাৎ দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরপূর্ব বাংলা বোঝাত।(সেন, সুকুমার ঃ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ১৯৭২ পৃ. ৮)। প্রাগার্য বিভিন্ন জাতি অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল এখানকার অধিবাসী ছিল। এদের ছিল নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি । মৌর্যবিজয়ের পর থেকে (আ. খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ) এই অঞ্চলে আর্যীকরণ শু হয় এবং তা চলে আঃ ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত । তার আগে এখানে 'আর্যভাষার এবং আনুষঙ্গিক উত্তর ভারতের গাঙ্গ উপত্যকার সভ্যতার বিকাশ ঘটে নাই' বলে কারও কারও অভিমত। এই সময়ের মধ্যে এখানকার অধিবাসীরা ধীরে ধীরে নিজেদের ভাষা ও আচার - ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। উত্তর ভারতের আর্যসভ্যতা ও ভাষার ক্ষেত্রে মাগধী প্রাকৃতের প্রভাবে দেশজ অধিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে বিকশিত হতে থাকে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের 'অ ার্যীকরণ' বলতে প্রাচীন বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদের প্রচার ও প্রসারই মুখ্যত অভীপ্সিত । ঐ মতবাদগুলির আলোকে এখানকার বাসিন্দাদের জীবন আলোকিত করার চেষ্টা চলে এই সময়ে। জৈন 'আয়ারঙ্গ সুত্তে ' অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, এই কাজ করতে এসে জৈন প্রচারকদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। রাস্তাঘাট-বিহীন জাঙ্গল ভূভাগে জৈন সন্তদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। হয়তো এই গোটা অঞ্চলের মানুষেরা এরূপ ছিল না। জৈন সাধুপ্রচারকেরা মগধের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার উত্তরপশ্চিমে বর্তমান পুলিয়ায় প্রবেশ করেন এবং আদি বাসিন্দাদের

তাদের মতে এনে অহিংস করে তোলার চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টা খারাপ ছিল না। তবুও প্রথমদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা বহিরাগত জৈন প্রচারকদের বিরোধিতাই করেছিল। কিন্তু কালক্রমে তারা ধীরে ধীরে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণে এক আমূল পরিবর্তন আনে। সংস্কৃতজ মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাষার মিশ্রণে এক নতুন ভাষা জন্ম নেয়। অবশ্য, এই পরিবর্তন ঘটেছিল দীর্ঘকাল ধরে। জীবনযাত্রার ধরণধারণ ও ভাষার পরিবর্তনের সাথে 'উত্তরভারতীয় মিশ্র আর্য'দের সঙ্গে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের মিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব হোল, তাদের বংশধর বর্তমান বাঙালি। এই সংমিশ্রণে তাদের মধ্যে দেখা গেল উন্নততর পর্যায়ের মানসিক পরিবর্তন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'এইরূপে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য্য— এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল । উত্তর ভারতের গাঙ্গ সভ্যতাই যেন নবসৃষ্ট আর্য্যভাষী বাঙ্গালী জাতির জন্মনীড় হইল। রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী মুখ্যত অনার্য্য ছিল। যেটুকু আর্য্যরক্ত বাঙ্গালী জাতির গঠনে আসিয়াছিল সেটুকু আবার উত্তর-ভারতেই অনার্য্যমিশ্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আর্য্যভাষার সঙ্গে সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি একটা নূতন মানসিক নীতি বা বিনয়-পরিপাটি,যাহাকে ইংরেজিতেdiscipline বলে, তাহা পাইল; বাঙ্গালীর অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য্য মনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গলের কারণই হইল। আর্য্যমনের-ব্রাহ্মণ্যের-এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।' ('বাঙ্গালীর সংস্কৃতি',পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ পৃ. ৭-৮, ১৯৯০)

এই অঞ্চলে মৌর্যদের আধিপত্য বিস্তারের প্রথমদিকে প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধনে মৌর্য শাসনব্যবস্থা যে ভালো রকম কায়েম হয়েছিল, তা স্থানীয় শাসকের একটি লিখিত আদেশ থেকে জানা যায়। এই আদেশটি প্রাকৃত ভাষায় অশোকের সময়ের ব্রাহ্মীহরফে একটি লেখে খোদিত এবং আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে উৎকীর্ণ। লেখটি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত মহাস্থানগড় (বগুড়া জেলা) থেকে পাওয়া গেছে। আদেশটি পুণ্ড্রনগরের 'মহামাত্র'কে দেওয়া হয় ।কাজেই ঐ সময় বা তার আগে থেকে অশোকের স্তম্ভ অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রাকৃতের চলন পুণ্ড্রবর্ধনে (বর্তমান উত্তরবঙ্গ) ছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্তসম্রাটদের আমলে সমগ্র বাংলাদেশ তাদের অধীনে আসে এবং সেসময় এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। নানা স্থানে বেশ কিছু মন্দিরাদি নির্মিত হয়, যার ধবংসাবশেষ ঐ সব স্থানে পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে গুপ্তসম্রাটদের সুশাসনে বর্তমানের অখণ্ড বাংলা ভালোভাবেই শাসিত হয়েছিল। তার প্রমাণ, এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া কয়েকটি শিলালেখ ও তাম্রশাসন। এই লেখ ও শাসনগুলিতে গুপ্তরাজাদের সময়ে বাংলাদেশ যে নানা বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত ছিল, তা জানা যায় এবং এই সব বিভাগ ও উপবিভাগের শাসনকর্তার কিছু কিছু নাম ও উপাধিও জানা যায় ।'লেখ' ও 'শাসন' সবই সংস্কৃতে রচিত । কাজেই সংস্কৃত যে তখন রাজভাষা ছিল,তাতে কোন সন্দেহ নেই । গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ-কোন সময় পাটলিপুত্র ও কখনও বা উত্তরবঙ্গ (পুণ্ড্রবর্ধন) থেকে শাসনকার্য সম্পন্ন করতেন। মাগধী প্রাকৃত ছিল পূর্বাঞ্চলের কথ্যভাষা।

গুপ্তশাসনের অবসানে শশাঙ্কের সময়েও (খ্রি. সপ্তম শতকের প্রথম পাদ) বাংলায় তাঁর সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ণসুবর্ণে তাঁর রাজধানী ছিল। শশাঙ্কের রাজ্যসীমা দক্ষিণপশ্চিমে দণ্ডভুক্তি (বর্তমান মেদিনীপুর ও ওড়িশার বাল্বের) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে তাঁর আমলের তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে জানতে পারা যায়, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও গ্রামমুখ্যের মাধ্যমে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হোত। তাম্রশাসনে বহু গ্রাম, কোন কোন 'বিষয়' (জেলা) এবং 'অধিকরণের' নাম পাওয়া যায়। ভুক্তিপতি, বিষয়পতি ও স্থানীয় শাসনকর্তাদের নাম ও উপাধিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা অনেকেই স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন। আবার, কখনও বা রাজধানী থেকে উচ্চপদস্থ আধিকারিক বা শাসনকর্তাকে নিযুক্ত করা হত। ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনুরক্ত পরমশৈব শশাঙ্কের সময়ে গৌড়বঙ্গে যে আর্যব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা অনুমেয় ।

তাম্রলিপ্ত সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর ও বৌদ্ধধর্মকেন্দ্র তাম্রলিপ্ত অন্তত খ্রি. অষ্টম

শতকে পালরাজত্ব শু হওয়া পর্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই তাম্রলিপ্তে বহু হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধ বিহার যে ছিল, চীনা পরিব্রাজক ফা-সিয়েন ও সুয়াঙ সাঙ (হিউয়েন সাঙ)-এর বিবরণী থেকে তা পরিস্ফুট। সেকালে সুহ্মদেশের রাজধানী যে তাম্রলিপ্ত বা 'দামলিপ্ত' ছিল, তা খ্রি. সপ্তম শতকের লেখক কবি দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' থেকে জানা যায়। উত্তর চবিবশ পরগণার চন্দ্রকেতুগড়ের ধবংসস্তূপ প্রাচীন 'গাঙ্গে' নগরীর ধবংসাবশেষ বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার মহাস্থানগড়ের ধবংসস্তূপকে কেউ কেউ প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের ধবংসাবশেষ বলে মনে করেন। এছাড়া আরও অনেক ধবংসস্তূপ বা ধবংসাবশেষ আছে যেমন, মঙ্গলকোটে (বর্ধমান) এবং মহানাদে (হুগলি) যেগুলি প্রাচীন কোন সমৃদ্ধ নগরীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়।

এগুলি থেকে প্রাচীন বাংলার খণ্ড খণ্ড চিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। কিন্তু একটি অখণ্ড বাংলা বা একটি সামগ্রিক বাঙালিসত্তা তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। এমনকি, তার ভাষাও পূর্ণরূপ লাভ করেনি। পালবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বে বেশ কিছুকাল ধরে চলেছিল রাজনীতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রধমার্ধে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্রভূমিতে পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও অন্য ধর্মমতে উদারহৃদয় পালসম্রাটরা এক নবযুগের সূচনা করলেন। তাঁদের রাজত্বকালে বাংলাভাষা তার নিজস্বরূপ নিতে শু করে। মাগধী প্রাকৃত ও বাংলায় প্রচলিত অপভ্রংশ— উভয়ের সংমিশ্রণে এক নতুন দেশীয় ভাষার উদ্ভব হোল আনুমানিক দশম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। বর্তমান বাংলাভাষার এটিই হোল আদিরূপ। রচিত হল বৌদ্ধ গুদের দ্বারা উচচশ্রেণীর সাহিত্য— চর্য াপদ। পরবর্তীকালে চর্যাপদের এই ভাষা যাকে 'সন্ধাভাষা' বলা হয়, আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এবং এই ভাষায় রচিত হল উচচ শ্রেণীর সাহিত্য। পালসম্রাটরা বাঙালি ছিলেন, এটা অনেকের ধারণা। তাঁদের সুশাসনে বাংলায় পূর্ববর্তী অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দূর হোল। পুণ্ড্রবর্ধনে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সম্রাট রামপালদেবের সময়ে গৌড়ের 'রাম াবতী'তে রাজধানী নতুন করে তৈরি করা হয়। পাল-বংশের প্রথম রাজা গোপালদেবের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের কন্যা ও উত্তর াধিকারিণী দেদ্দদেবীর বিবাহ হয় এবং তার ফলে গোপালদেব গৌড়সিংহাসন লাভ করেন। গোপালদেবের পুত্র বিখ্য াত ধর্মপালদেব তাঁর রাজ্যসীমা বহুদূর বিস্তৃত করেন এবং পাহাড়পুরে (রাজশাহি জেলা) প্রসিদ্ধ সোমপুর সোমপুর মহ াবিহার স্থাপন করেন। পরবর্তী প্রসিদ্ধ সম্রাট মহীপালও (৯৭৭ খ্রি. - ১০২৭ খ্রি.) ছিলেন বিরাট যোদ্ধা। রামপালদেব গৌড়ে রামাবতী নামে যে রাজধানী স্থাপন করেন, তা ছিল গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী স্থান। পাল-বংশের পর সেনর াজবংশের রাজধানী এরই কাছাকাছি ছিল গঙ্গা ও মহানন্দার মধ্যবর্তী স্থান। পরে তা 'লক্ষ্মণাবতী' নামে পরিচিত হয় শেষ সেনরাজা লক্ষ্মণসেনের নামে। মুসলমানবিজয়ের পর এরই কাছাকাছি গৌড় নগরী ও বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাল-বংশের দীর্ঘশাসনে বাঙালি এক পৃথক জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার আপন ভাষায় চর্যাপদের মতো সা হিত্যসম্পদ সৃষ্ট হওয়া ছাড়াও স্থাপত্যশিল্পে এক নতুন যুগের উদ্ভব হয়। গুপ্তযুগে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্প সমৃদ্ধ হয়েছিল, পালযুগে তা সমৃদ্ধতর হয় ও এক নতুন শৈলী জন্মলাভ করে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এই শৈলীকে আমরা 'পূর্বী ধারা' বা 'ইস্টার্ন স্কুল' নামে অভিহিত করতে পারি। বিটপাল, ধীমানের মতো শিল্পী তাঁদের অসংখ্য মূর্তিভাস্কর্যে এই নতুন শিল্পরীতিকে অমর করে রেখেছেন। টেরাকোটা-শিল্পেরও এক নতুন ধারা গড়ে ওঠে। পাহাড়পুর-মন্দিরের (আ. খ্রি. নবম শতক) ধবংসাবশেষ থেকে যেসব 'টেরাকোটা'- ফলক পাওয়া গেছে, সেগুলি বৃহদায়তন এবং এগুলির কাক ার্যে স্বাচছন্দ্য, পরিচছন্নতা ও সজীবতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেযুগের সামাজিক চিত্রও এখানকার অনেক টেরাকে াটা-ফলকে প্রতিফলিত। প্রস্তরমূর্তিগুলির মধ্যে গুপ্তযুগের মতো দেহসৌষ্ঠব ও ভাবপ্রকাশের প্রাধান্য থাকলেও অলঙ্করণের দৈন্য নেই। তবে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে সেন-আমলের মূর্তির মতো অলঙ্করণ ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় না। গুপ্তযুগে 'দালান' মন্দির থেকে এবং 'দালানের' ওপর 'শিখর' স্থাপন করে যে 'নাগর' -শৈলীর মন্দিরস্থ াপত্যের উদ্ভব হয় এবং উত্তর ও মধ্য ভারতে এবং ওড়িশায় বিস্তার ও উৎকর্ষ লাভ করে , পালযুগে পূর্বভারতের মগধে তার এক নিজস্ব ধারার উন্মেষ ঘটে। ইঁটের মন্দিরগুলিতেই ঐ রূপটি বিশেষভাবে ধরা পড়েছিল। বাংলায় এইর ূপ অনেক মন্দির নির্মিত হয়— ইঁট ও পাথর এই দুই উপাদানেই। সেন-যুগে ঐ একই স্থাপত্য-শৈলী অব্যাহত থাকে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন বাংলায় মন্দিরস্থাপত্যের এই 'শিখর' রীতিকে 'পাল-সেন রীতি' নামেই অভিহিত করা যায়। এই সব নয়নাভিরাম মন্দিরগুলি বন্ধুবর্মার 'মান্দাসোর শিলালেখে' উল্লিখিত দশহর নগরের 'কৈলাসতুঙ্গ-শিখরের' মতো ছিল। পরবর্তী আলোচনায় তা পরিস্ফুট হবে। মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ স্থাপত্যালঙ্কারের অপরূপ সৌন্দর্য (বিশেষ করে, ইঁটের মন্দিরে), রেখাবিন্যাস ও স্বতঃস্ফুর্ত 'অঙ্গশিখর', 'ভূমি আমলক' এবং 'রিলিফে' উৎকীর্ণ অন্যান্য নকশা বা অল্পস্বল্প মূর্তি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালেখে উল্লিখিত আছে, প্রাচীন বাংলা- মন্দিরগুলির শিখর ছিল খুবই উচ্চ, তাদের শিরোভাগে থাকত স্বর্ণকলস, এরা যেন সূর্যের গতিকে বাধা দিত। মন্দিরগুলি ছিল যেন পৃথিবীর ভূষণ বা অলঙ্কার। এই ধরনের মন্দির যা প্রাসাদের একটি শৈলী, সেটি 'পুণ্ড্রবর্ধনক' নামে 'সমরাঙ্গণসূত্রধার' নামক শিল্পশাস্ত্রগ্রন্থে স্বীকৃত হয়। প্রাসাদ ছিল 'হল'-ঘরযুক্ত অট্টালিকা এবং এর ছাদের চারদিকে থাকত শিখর। এরূপ মন্দির ছিল হরির প্রিয়। 'সমরাঙ্গণসূত্রধার' গ্রন্থের বিবরণী থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে বা পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিতে এইরূপ অনেক মন্দির যে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর একটি নিজস্ব শৈলীর সৃষ্টি হয় যা 'পুণ্ড্রবর্ধনক' নামে পরিচিত হয়। সুয়াঙ সাঙের (হিউয়েন সাঙ) বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সেইসময়ে (খ্রি. সপ্তম শতকের প্রথমপাদ) তিনি সারা বাংলা ভ্রমণ করে তিনশরও বেশি মন্দির লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি ভিতরগাঁও-এর (কানপুর জেলা, মন্দিরটি এখনও বর্তমান ও অক্ষত) ইঁটের 'শিখর'-মন্দিরটিও দর্শন করেন। বিশাল মহাবোধি মন্দিরও তিনি দেখেন। পালযুগে অতলায়তন সরোবর বা দীঘি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চ 'শিখর'-মন্দিরও অধিক সংখ্যায় নির্মিত হ'ত। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' শোণিতপুরের (দেবীকোট , বাণগড়) ঐশ্বর্যবর্ণনার মধ্যে বলা হয়েছে, এখানকার বহু মন্দির ভক্ত-উপাসকদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত এবং দীঘিগুলো প্রস্ফুটিত পদ্মফুলে পূর্ণ ছিল। 'রামচরিতে' 'রামাবতী' নগরীর বর্ণনায় তাকে 'সুরেন্দ্রপুরী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নগরীটি ছিল 'মন্দিরপুরী' এবং এখানে সারিবদ্ধ প্রাসাদ ছিল। গৌড়ে রামাবতী ছিল পালর াজবংশের শেষ রাজধানী।

পাল-সেন যুগে বাংলায় আঞ্চলিক 'শিখর'-স্থাপত্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু এই আঞ্চলিক 'শিখর'-স্থাপত্য ছাড়া উত্তর ভারতীয় 'নাগর'- শৈলীর ওড়িশা রাজ্যে বিবর্তিত 'রেখ'-রেখ'-দেউল নামে পরিচিত মন্দিরস্থাপত্যও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় একই সময়ে প্রচলিত হয়। কোন কোন শিলালেখে (হোলাল থেকে প্রাপ্ত) 'নাগর', 'দ্রাবিড়' এবং 'বেসর'-শৈলীর সঙ্গে 'কালিঙ্গ' এর উল্লেখ আছে। ওড়িশী রীতির মন্দিরগুলিকে এই শৈলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু শিল্পশাস্ত্র 'মানসার' গ্রন্থে 'কালিঙ্গ' হোল এক প্রকার সৌধ, পরন্তু কখনই একটি পৃথক শৈলী নয়, একথা বলা হয়েছে। অতএব 'কালিঙ্গ' যে শুধু 'নাগর'-শৈলীর অন্তর্ভুক্ত, তা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। যেহেতু, উক্ত শৈলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও এই রীতি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এবং কলিঙ্গের স্থপতিদের হাতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং ওড়িশার বিখ্যাত মন্দিরগুলি ঐ রীতিতে তৈরি হয়েছিল, তাই পৃথক মর্যাদায় ভূষিত করার জন্য শিল্পশ াস্ত্র ও শিলালেখে একে 'কালিঙ্গ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রীতির শুধুমাত্র 'রেখ'-রেখ'-দেউল (জগমোহন-বর্জিত) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বেশ কিছু নির্মিত হয়েছিল প্রাক-মুসলিম যুগে, যার কোন কোন নিদর্শন এখনও লক্ষ্য করা য ায়। পরবর্তী আলোচনায় তা জানা যাবে। তাই পাল-সেন যুগে আঞ্চলিক 'শিখর'-স্থাপত্যের সঙ্গে আঞ্চলিক ওড়িশী 'রেখ'- স্থাপত্য দুটিই পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। এর পেছনে রাজনীতিক একটি কারণ হল, পাল ও সেনবংশীয় সম্রাটরা উত্তর, পূর্ব, কামরূপ (প্রাগজ্যোতিষ) ও মধ্য বঙ্গে এবং মগধ, এমনকি, বারাণসী পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করলেও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ওড়িশার গঙ্গ-বংশীয়দের শাসন অব্যাহত ছিল। গঙ্গরাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ খ্রি. একাদশ শতকের শেষভাগে ত্রিবেণী (হুগলি) পর্যন্ত তাঁর রাজ্যবিস্তার করেন। অবশ্য, মুসলমান-বিজয়ের পর ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণদিকে কিছু অংশ হাত ছাড়া হয়ে যায়। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গঙ্গরাজাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ওড়িশী সংস্কৃতির প্রসার ও ওড়িশী শৈলীর বহু মন্দির ঐ অঞ্চলে নির্মিত হয়। এর মধ্যে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের 'ভৌমকর'রাও কিছুকাল মেদিনীপুর অঞ্চলে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তা জানা যায়, কয়েক বছর আগে আ বিষ্কৃত একটি খন্ডিত শিলালেখ থেকে। ভৌমকরদের রাজধানী ছিল খিচিচন্দ্রকোণাক্টং-এ। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণ ার মাধবপুরে প্রাপ্ত এই খন্ডিত শিলালেখটি আঠার সারির এবং এতে 'ভৌমকর' অব্দাঙ্ক ৩৬৮ উৎকীর্ণ বলে অনুমান

করা যায়, যা ১১০৪ খ্রিস্টাব্দের সমাঙ্ক। শিলালেখের অক্ষরের ছাঁদ বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রপট্ট (আ. ১১৫৯ - ১১৭৯) এবংলক্ষ্মণসেনের (আ. ১১৭৯ - ১২০৬) আনুলিয়া তাম্রপট্টলেখের অক্ষরের সদৃশ। আবিষ্কৃত শিলালেখটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, 'সুবর্ণ' নামে এক নির্মাণদক্ষ ব্যক্তি শিবমন্দিরের ওপর একটি 'শিখর' নির্মাণ করেন। 'রাঢ়শ্রী' বিশেষণযুক্ত অর্থাৎ 'রাঢ়ের গৌরব' এক ভক্তিমতী মহিলা 'সহাস্য' অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে মন্দিরটি শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। সেই শিবলিঙ্গটি ছিল 'বঙ্গের অলঙ্কার'। খণ্ডিত এই লিপি থেকে একটি শিবমন্দিরে 'শিখর' যোগ করার ('যদ্বিমানীকৃতং শিবমন্দিরম্') কথা জানা যায়। অতএব ঐসময় মেদিনীপুরের ঐ স্থানে মাধবপুর বা তৎসন্নিহিত স্থানে বা নিকটবর্তী অন্য কোন স্থানে 'শিখর'-দেউল নির্মাণের কথা আমরা জানতে পারি। লেখের হরফ 'প্রায়-বঙ্গাক্ষর'। কিন্তু কথায় ও অঙ্কে ৩৬৮ বা 'অষ্টাষষ্ঠ্যধিকত্রিশতবৎসরপ্রগতে' থাকায় এটি 'ভৌমকর' অব্দ বলে অনুমান। এই অব্দের প্রচলন হয় ৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে। আলোচ্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১১০৪ খ্রিস্টাব্দ। তখন বাংলায় রামপালদেবের শাসন অপ্রতিহত। গৌড়ের 'রামাবতী'তে তাঁর রাজধানী। সেন-বংশের শাসন তখনও বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

উপরি আলোচিত 'শিখর' বা 'রেখ'-স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে অপর যে শৈলীর স্থাপত্য প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে, তা ছিল 'পিঢ়' বা 'ভদ্র' রীতির। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের ছাদ ওপরে ক্রমহ্রস্বায়মান 'পিঢ়া' বা 'থাক' যুক্ত হয়ে শীর্ষদেশে মিলিত হোত। কিন্তু সমকালীন সাহিত্যে বা শিলালেখে 'শিখর'-শৈলীর মন্দিরের উচ্চ প্রশংসা করা হলেও 'পিঢ়' রীতির মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই শৈলীর মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শনও তেমন পাওয়া যায় না। তবুও বহু মূর্তিভাস্কর্যে এর আদর্শ প্রতিরূপ উৎকীর্ণ থাকায় (এই বিষয় পরে আলোচ্য) এই শৈলীর মন্দিরের অস্তিত্ব অনুমান করা কঠিন নয়। তবে এই পিঢ়-রীতির মন্দিরসম্পর্কে সরসীকুমার সরস্বতী বলেছেন ঃ বাংলার পিঢ় - মন্দিরগুলির 'পিঢ়া' বা 'থাক' ওড়িশার পিঢ়ের তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, প্রতিটি 'পিঢ়া' এক একটি তল বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া এগুলিতে 'রথ'-বিন্যাসও আছে। প্রাচীন বাংলার 'পিঢ়'-দেউলগুলি যে 'রথ' যুক্ত ছিল, তা বোঝা যায় ।

পালযুগে আলোচ্য এই স্থাপত্যরীতির আঞ্চলিক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অখণ্ড ভারতের অংশরূপে এই অঞ্চলে এইসময় বাঙালি জাতির উদ্ভব এবং এই সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষা মাগধী অপভ্রংশে সাহিত্যরচনার সূচনা হলেও সংস্কৃত গুপ্তযুগের মতো উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের ভাষা ছিল। পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতিধর প্রভৃতি যেসব কবি ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে, তাঁরা সকলে সংস্কৃতেই তাঁদের সাহিত্য রচনা করেন। সেই সব কাব্য ও রচনা কালের গণ্ডী পেরিয়ে আজও সমাদৃত। সেসময়ের বাঙালির মাতৃভাষা সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা লাভ করেনি। সন্ধা-ভাষায় রচিত চর্যাগীতিগুলি উচ্চ বিদ্বৎসমাজেও বিশেষ সমাদর লাভ করতে পারে নি। অবশ্য, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কিছুটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় বাংলায় সেন-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে হিন্দুযুগও শেষ হোল। মুসলমান- বিজয়ের ফলে বাংলায় এল এক নতুন যুগ । গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগের অবসান পর্যন্ত স্থাপত্যশিল্পে সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের যে এক ধ্রুপদী রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেও যা ছিল সমুজ্জ্বল, তার বিকাশ ও গতি রূদ্ধ হয়ে পড়ল। সু-উচ্চ 'শিখর' ও অন্যান্য দেউলগুলি যা ছিল প্রাচীনবাংলার সম্পদ ও গৌরব, সুলতানী শাসনের প্রথম প্রায় দুশ বছরে সেগুলিকে সম্পূর্ণ ধবংস করে সেই ধবংসাবশেষ দিয়ে মসজিদ, মাজার তৈরি করাই ছিল মূল লক্ষ্য। সুন্দর সুন্দর মূর্তিগুলি ভেঙে তার অবশিষ্ট অংশে ফারসী আরবী লিপিতে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হল। বাংলার গৌড়,পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী এবং হুগলির পাণ্ডুয়ায় নির্মিত হ'তে থাকল বিশালায়তন মসজিদ ও কবরসৌধ। কিন্তু সে ইতিহাসে আসার আগে প্রাক-মুসলিম বাংলায় পূর্বোক্ত মন্দিরস্থাপত্যশৈলীর বিকাশধারার স্বরূপটি আমাদের জানা প্রয়োজন।

(লেখাটি প্রনব রায়ের ‘বাংলার মন্দির’ বইটি থেকে সংগ্রীহিত)